শ্বেতপাথরের টেবিল

BANGLADARSHAN.COM

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥শ্বেতপাথরের টেবিল॥

শ্বেতপাথরের টেবিলটা ছিল দোতলায়, দক্ষিণে রাস্তার ধারের জানালার পাশে। ঠিক চৌকোও নয়, গোলও নয়। চারপাশে বেশ ঢেউ-খেলানো। অনেকটা আলপনার মত। বেশ বাহারি একটা ফ্রেমের উপর আলগা বসানো। নিজের ভারেই বেশ চেপে বসে থাকত। পাথরটা প্রায় মন দুয়েক ভারি। ফ্রেমের চারদিকে জাফরির কাজ করা কাঠের ঝালর লাগানো ছিল। সারা ফ্রেম ঘিরে ছিল অসংখ্য কাঠের গুলি। গোল গোল ডাম্বলের মত। দুদিক সরু। অনেকটা পালিশ করা পটলের মত। ঘোরালে সেগুলো বনবন করে ঘুরত। পায়া চারটে ছিল কারুকার্য-করা থামের মত। তলায় ছিল ভরাট পাদানি।

যে বয়সে আমার বাবার যৌবন ছিল, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল ছিল, সামনে চেরা সিঁথি ছিল, ঠোঁটের উপর বাটার-ফ্লাই গোঁফ ছিল, যে বয়েসে তিনি বিকেলে পায়ে বার্নিস-করা জুতো পরে, ইয়ংসাহেবের উপহার দেওয়া গ্রেহাউন্ড চেনে বেঁধে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, সেই সময় টেবিলটারও যৌবন ছিল। বাবাই কিনেছিলেন নিলাম থেকে। টেবিল আর কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো যায় এমন একটা দোলনা একই সময় বাড়িতে এসেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

বড় হতে হতে আমার চিবুকটা যখন শীতল পাথরে রাখার মত অবস্থায় এল তখন দেখতাম রোজ সকালে চেয়ারে উবু হয়ে সামনে একটা ডিমের মত আয়না রেখে বিচিত্র-মুখভঙ্গি করে বাবা দাড়ি কামাচ্ছেন। দাড়ি কামাবার সময় পাশে দাঁড়াবে বাবা খুব রেগে যেতেন। এমনিই বাবার খুব দাপট ছিল। সে যুগটাই ছিল বাঙালীর দাপটের যুগ। রাগী ছিলেন তেমনি। রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে, বাড়িতে দু'জন যুবক কাজের লোক ছিল, পালা করে এক একদিন এক একজনকে জুতোপেটা করে একটা লুঙ্গি পরে এই টেবিলে বসেই রাগ-রাগ মুখ করে চা খেতেন। আর ঠিক সেই সময় আমার শান্তশিষ্ঠ মজলিশী মেজ জ্যাঠামশাই বাঁ পাশের হাতলহীন খালি চেয়ারে এসে বসতেন। গায়ে একটা খড়খড়ে তোয়ালে। চুলে কলপ লাগাতেন। খানিকটা অংশ কালো, খানিকটা লাল, জায়গায় জায়গায় সাদার ছিট।

জ্যাঠামশাই বোঝাতেন রাগ জিনিসটা ভাল নয়। বিশেষ করে দিনের শেষে অফিস থেকে ফিরেই এই ধরনের জুতোজুতি শরীরের বাড়তি এনার্জি টেনে নেয়। চাকরবাকরেরা একটু আডামেন্ট হয়েই থাকে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃদু স্বভাবের জন্যে বাবা খুব একটা পাত্তা দিতেন না। কে বড়, কে ছোট বোঝাই যেত না। চায়ের কাপটা খটাং করে টেবিলে রেখে বাবা বলতেন, 'তুমি আর এর মধ্যে নাক গলাতে এস না। ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট থিং ডিসিপ্লিন। ছেলেটার দিকে তাকাতে হবে। ওরা দুপুর বেলা নিজেদের মধ্যে খেস্তাখিস্তি করেছে। অশ্বতর বলেছে।' বাবা খুব পিউরিটান ছিলেন, খচ্চর শব্দটা উচ্চারণ করলেন না। অফিস থেকে এসে দাঁড়ানো মাত্রই রিপোর্টটা আমারই পেশ করা। আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান। লম্বা বারান্দার এধার থেকে ওধার, বাবা আর

নিরঞ্জনের ছুটোছুটি। পুবদিকের প্রান্ত থেকে পেটাতে পেটাতে পশ্চিমের সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত এসে জুতো ফেলে দিলেন।

জ্যাঠামশাই নিরঞ্জনকে ভালবাসতেন, কারণ নিরঞ্জন রবিবার সকালে পচা পাঁউরুটি কুঁড়ো পনির আর পিঁপড়ের ডিম দিয়ে তরিবত করে জ্যাঠামশাইকে মাছের চার মেখে দিত। সেই কারণেই বোধ হয় নিরঞ্জনের হয়ে সালিশি করতে এসেছিলেন। কিছু আর বলার রইল না। আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে চলে গেলেন। অশালীন কথা বাবা কোনো সময়েই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একদিন ছুটির সকালে এই পাথরের টেবিলে দাদু আর বাবা মুখোমুখি বসে মুড়ি তেলে-ভাজা খাচ্ছিলেন। শ্বশুর আর জামাইয়ের গল্প বেশ জমে উঠেছে। দাদু বারকয়েক 'শালা' বলেছেন। শালা পর্যন্ত অ্যালাউড। হঠাৎ দাদু বলে উঠলেন কি একটা কথা প্রসঙ্গে–'পাছার কাপড়।' বাবা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে একটা ঠোঙা নিয়ে এলেন। দাদুর মুড়ি আর তেলে-ভাজার বাটিটা টেনে নিয়ে ঠোঙায় ঢেলে ফেললেন। ঠোঙাটা দাদুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে কিংবা রকে বসে খান। টেবিলে বসে খাবার মত সিভিলাইজড্ আপনি নন। আপনার স্ফিয়ার আলাদা।' বৃদ্ধ মানুষ। টকটকে গায়ের রঙ। লম্বা চওড়া পালোয়ানের মত চেহারা। বাবার কথায় মুখটা আরো টকটকে হয়ে উঠল। ছেলেমানুষের মত হয়ে বললেন, 'কেন বল তো? হঠাৎ কি হল তোমার!' দাদু তখনো অপরাধটা বুঝতে পারেননি। বাবা বললেন, 'আপনি ভীষণ স্ল্যাং।' দাদু অপরাধীর মত মুখ করে বললেন, 'ওহো, ওই পা–'

BANGLADARSHAN.COM

বাবা হাত তুলে বললেন, 'ডোন্ট রিপিট।' দাদু এবার ভয় পেয়ে গেলেন, 'কি বলব তাহলে?' বাবা বললেন, 'কেন, পেছনের কাপড়, কি পরনের কাপড় বলা যায় না!' দাদু তখনও হাল ছাড়লেন না। নিজের সপক্ষে একটু ক্ষীণ ওকালতি করতে গেলেন। বললেন, 'সেকেলে মানুষ তো। আমাদের সময়, বুঝলে পরমেশ্বর, ওই সব কথারই চল ছিল।' বাবা দাদুকে কোনো রকম ডিফেনসের সুযোগ না দিয়েই শ্বেতপাথরের টেবিল ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দাদু সেই মুড়ির ঠোঙাটা হাতে ধরে উদাস হয়ে বসে রইলেন। কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এক সময় করুণ হেসে বললেন, 'নাঃ, পরমেশ্বর দেখছি খুব রেগে গেছে।'

বাবার দাপটে সংসারে মা ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। ছুটির দিনে মাকে জীবিত কোনো প্রাণী বলে মনে হত না। অনেকটা ছায়ার মত নিজের কাজে ঘুরে বেড়াতেন। সারাদিনে বাবাকে বার চব্বিশ চা করে দিতেন। বাবাকে চা দেবারও একটা কঠিন কায়দা ছিল। কাপ থেকে ছলকে ডিশে এক ফোঁটা চা পড়লেই চা খাওয়া মাটি। কাপের কানায় চা ভরে ডিশের উপর ব্যালেনস করে আনতে হবে।

আমার মার একটা পা আর একটার চেয়ে বোধ হয় একটু ছোটো ছিল। সাবেক আমলের বাড়িতে ঘরে ঘরেই উঁচু চৌকাঠ, ফলে মার খুব অসুবিধে হত। চা হাতে যখন আসতেন মনে হত তরল বোমা নিয়ে আসছেন, একটু কেঁপে গেলেই বিস্ফোরণ।

মা যখন চা নিয়ে এলেন, দাদু তখনও ঠোঙাটি হাতে ধরে বসে আছেন। বাইরে তেলে-ভাজার তেল ফুটে উঠেছে। দাদু বললেন, 'চা আর খাবো না তুলসী, জামাই খুব রেগে গেছে।' মা ব্যাপারটা জানতেন, রান্নাঘরে গিয়ে আগেই আমি রিপোর্ট করে এসেছিলুম। মা ফিসফিস করে বললেন, 'চা খেয়ে আপনি চলে যান।' দাদু বললেন, 'আমি তো চলেই যেতুম রে, কিন্তু আটকে গেছি।' মা একটু অবাক হলেন, 'কিসে আটকে গেছেন?' দাদু বললেন, 'সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার!' মা একটু ভয় পেলেন। দাদু খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু বেহিসেবী ছিলেন, পাঁচপো দুধের সঙ্গে পুরো একটা কাঁঠালের রস, ডালের সঙ্গে আধ শিশি কাঁচা ঘি, এইসব ছিল তাঁর সাংঘাতিক খাওয়া। মা ভাবলেন দাদু হয়তো কাপড়ে করে ফেলেছেন। আগে একবার দু'বার এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে। মা বললেন, 'করে ফেলেছেন।' দাদু খুব বুক ঠুকে উত্তর দিলেন, 'না না, সেরকম বিচ্ছিরি নয়।' সেই কাজটি করে ফেলেননি বলে যেন বেশ গর্বিত। 'তবে কি করেছেন?' মা যেন বেশ ধাঁধায় পড়লেন। দাদুর মুখটা যেন দুষ্টু ছেলের মত হয়ে উঠল। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, 'ডানহাতের আঙুলটা টেবিলে আটকে গেছে।' মা নীচু হয়ে বললেন, 'কই দেখি?' টেবিলের পাশে যে কাঠে হরতন, চিঁড়েতন, ইস্কাবন কাটা ডিজাইন ছিল তারই একটায় দাদুর ডান হাতের তর্জনীটা আটকে গেছে। মা বললেন, 'টেনে বের করে নিন না।' দাদু অসহায়ের মত বললেন, 'বেরোচ্ছে না।' 'ঢুকলো কি করে?' দাদু তখন ঢোকার বিবরণ দিলেন, 'পরমেশ্বর রাগ করে উঠে গেল তো, আমি একলা বসে আছি। অন্যমনস্ক আঙুলটাকে এই গর্ত সেই গর্ত এমনি করতে করতে হঠাৎ একটায় ফস করে ঢুকে গেল। হাতে তেল ছিল। ওমা, তারপর আর বেরোচ্ছে না কিছুতেই। জামাই মুড়ি আর তেলে-ভাজা যত্ন করে ঠোঙায় ঢেলে দিয়ে গেল। এখনো দুটো চপ খাওয়া হয়নি। ডান হাতটা আটকে গেছে।'

BANGLADARSHAN.COM

ভয়ে মার মুখ শুকিয়ে গেল। 'কি হবে এখন!'

দাদু ছেলেমানুষের মত বললেন, 'কাঠটা ভেঙে আঙুলটা বের করে নিতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর যদি রেগে যায়।' মা বললেন, 'না না, কাঠ ভাঙা চলবে না। কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। আপনি বরং আর একবার চেষ্টা করুন।' 'হচ্ছে না রে তুলসী। তখন থেকে ঘোরাতে ঘোরাতে ছাল উঠে গেল।' মা চায়ের কাপটা শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রেখে উত্তরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই দিকে এক ফালি জমিতে বাবার কিচেন গার্ডেন। ভাল রোদ পড়ে না। তবু বাবার সাধনার শেষ নেই। এক টুকরো জমিতে খুঁজলে সব গাছ পাওয়া যাবে। রোদের অভাবে সমস্ত গাছই উচ্চতায় বিশাল। গোটা কতট পেঁপে গাছ তিনতলার ছাদের কার্নিস ছুঁতে চলেছে। বাবা তখন বাগানে। সঙ্গে সহকারী নিরঞ্জন। সকালে নিরঞ্জনের মত লোক হয় না। সন্ধ্যেবেলা সেই নিরঞ্জনকেই জুতো-পেটা। গাছের গোড়ায় গোড়ায় পচা খোলের জল দেওয়া চলেছে। একটু বেসামাল হলেই নিরঞ্জন চারাগাছ মাড়িয়ে ফেলবে। বাবা মাঝে মাঝেই হাঁ হাঁ করে উঠছেন, 'যাঃ, সর্বনাশ করে ফেললি, ড্যাফোডিলটা গেল।' নিরঞ্জনের দৃকপাত নেই, 'না না ছোটবাবু।' বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'ব্লাডি বাগার, পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছিস, ক্রিস্ট্যালাইজড ইডিয়েট। ওই জন্যে বলে মিনিমাম এডুকেশন দরকার।' নিরঞ্জন বলছে, 'সব জায়গাতেই তো গাছ। না মাড়িয়ে যাবো কি করে?' 'কেন, তোর বুড়ো আঙুলে

কি পক্ষাঘাত হয়েছে, এইভাবে যাবি, টিপ টো কাকে বলে জানিস, এই দেখ।' বাবা দেখাতে গেলেন, 'যাঃ গেল, নিজেই শেষে মাড়িয়ে ফেললুম, ফ্লুসটা গেল, দূর ছাই।' নিরঞ্জন ভরসা দিল, 'ও একটা দুটো যাবেই বাবু। পেটের সবকটা ছেলেই কি আর বাঁচে। একটা দুটো মরেই।' বাবা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। লাগা, তুই দিয়ে যা। গোড়া থেকে ছ' ইঞ্চি দূরত্ব থাকবে মনে থাকে যেন।' মা জানতেন এই ব্যাপার চলবে বেলা বারোটা অবধি। ওইখানে দাঁড়িয়েই মশার কামড় ও বার কয়েক চা খাওয়া চলবে। তারপর গাছের বাড়তি ডাল কাটতে গিয়ে হাত কেটে, ওপরে উঠে আসবেন–গেল গেল করতে করতে। আয়োডিন আর ব্যান্ডেজ তৈরিই রাখা আছে।

মা উত্তরের বারান্দা থেকে দক্ষিণে টেবিলের সঙ্গে আটকে-থাকা দাদুর কাছে চলে এলেন। সামনেই রাস্তার ওপারে সনাতনের ছোট্ট ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান। সারাদিন ছোট্ট হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠাক করে কাজ করে। লম্বা, কালো পাকানো চেহারা। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে খুলে বিড়ি মুখে দিয়ে যখন এ বাড়ির জানালার দিকে তাকায় তখন দেখেছি চোখ দুটো ঘোলাটে হলুদ। মা বললেন, 'সনাতনকে একবার চুপি চুপি ডেকে আনতে পারিস?' সনাতন এসে হাজির, 'কি বলছেন মা?' রোগা হলে কি হয়, বাজখাঁই গলা। মা ফিসফিস করে বললেন, 'আস্তে-আস্তে।' সনাতন গলাটাকে যথাসম্ভব খাটো করে বলল, 'কি হয়েছে মা?' মা তখন সনাতনকে ব্যাপারটা দেখালেন। হাঁটু মুড়ে দাদুর চেয়ারের পাশে বসে সনাতন টেবিলটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, দুটো স্ক্রু দিয়ে কাঠটা লাগানো আছে। স্ক্রু দুটো খুলে নিলেই কাঠটা আঙুলের সঙ্গে টেবিল ছেড়ে চলে আসবে লম্বা আংটির মত।' মা বললেন, 'তাহলে খুলে ফেলুন। খুব তাড়াতাড়ি। একটুও শব্দ করবেন না।' সনাতন খড়ম পায়ে সিঁড়ি দিয়ে খটাং খটাং করে নামছিলেন। মার কাঁচুমাচু অনুরোধে শুধু পায়ে হাতে খড়ম নিয়ে দোকানে চললেন যন্ত্র আনতে।

BANGLADARSHAN.COM

স্ক্রু দুটো অনেকদিনের। মরচে পড়ে মাথার ঘাট বোধ হয় বুজে এসেছিল। সনাতনকে বেশ কসরত করতে হল। টেবিলটাকে ঠেলে সরাবারও উপায় নেই। দাদু আঙুল আটকে বসে আছেন। ঘুপচিমত জায়গায় কোনো রকমে সনাতন অসাধ্য সাধনে ব্যস্ত। দাদুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বেশ মজা হয়েছে এমনি ভাব। মার মুখে চাপা উৎকণ্ঠা। একটা কান বাগানের দিকে পড়ে আছে। বাবার গলা শুনতে না পেলেই পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আসছেন।

হঠাৎ ঝরঝর করে এক গাদা পটলের মত গোল গোল কাঠ মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল। 'এই রে, কি হল' বলে মা এগিয়ে গেলেন। সনাতন টেবিলের পাশ থেকে হাসি হাসি মুখ তুলে বললেন, 'একটা পাশ খুলে ফেলেছি।' 'এগুলো খুললেন কেন?' মার প্রশ্ন। কাঠটা খুললেই তো এগুলোও খুলবে মা। উপরের কাঠের চাপে এই কেয়ারিগুলো ঠাস হয়ে ছিল।' সনাতন অন্য দিকটা খোলার কাজে মন দিলেন। দাদু দেখলেন চুপ করে থাকা ঠিক নয়। সনাতনকে তারিফ করে বললেন, 'বেশ কাজের লোক হে তুমি। ঠিক খুলেছো তো দেখছি।' মা তখন গোল কাঠগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে ঢাকছেন বামাল ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

কাঠের টুকরোটা অবশেষে টেবিলের মায়া ছেড়ে দাদুর পুরুষ্টু তর্জনীর সঙ্গে খুলে এল। দাদুর সে কি মুক্তির আনন্দ! মনে হল যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কাঠটা আঙুল সমেত দুবার ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'বেশ ফিট করেছে রে তুলসী!' দাদুর উল্লাসে মা ঠিক যোগ দিতে পারলেন না। জানি মার মনে তখন কি খেলা করছে। একটু পরেই ওই রুমাল আকৃতির এক টুকরো বাগান থেকে বাবা ঘর্মাক্ত চেহারা নিয়ে ওপরে উঠে আসবেন। মুখে নানারকমের অদ্ভুত শব্দ। খুব পরিশ্রম হলে বাবা জোরে জোরে মুখ দিয়ে হাওয়া ছাড়তেন। ফুস...স। ফুস...স। অনেকটা এখনকার প্রেসার কুকারের মত।

রবিবার দ্বিতীয় বিশাল কাজ ছিল, টেবিলের শ্বেতপাথর পুটি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা। আগের রবিবার ইচ্ছে করেই পরিষ্কার করেননি। সেও এক ঘটনা। আমার বন্ধু বিপুল, কপিং পেনসিল দিয়ে পাথরের উপর নাম লিখেছিল–বিপুল রায়। গোটা গোটা হাতের লেখা। যেদিন লিখে গেল তার পরের দিন বাবার চোখে পড়ল। বাবা পাশে 'অ্যারো' দিয়ে আরো বড় বড় করে লিখলেন ব্লাডি বাগার। দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা কি ছবি আঁকা, বইয়ের পাতার নাম সই, শ্বেতপাথরের টেবিলে নিজের নাম জাহির করা, খাতায় ঘিচু ঘিচু কিছু আঁকা দেখলেই বাবা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের জন্যে শুরু হত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। আমাদের বাইরের সদর দরজায় এই রকম লেখার লড়াই কার বিরুদ্ধে জানি না বেশ কিছু দিন চলছে। ঢোকার মুখে কোনো অতিথি একটু লক্ষ করলেই অবাক হবেন। প্রথম লেখা, বাঘের বাসা। লেখক বোধহয় আমাদের বাড়িকে 'বাঘের বাসা' নাম দেবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বাবা লিখলেন–'স্কাউণ্ড্রেল'। অদৃশ্য লেখক লিখলেন–'পাগলের আখড়া'। বাবা উত্তরে লিখলেন–'সোয়াইন'। উত্তর এল–'বাটারফ্লাই'। লেখক বোধহয় বাবার গোঁফ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। বাবা লিখলেন–'স্টুপিড'। বিশাল সদর দরজায় লেখার জায়গার অভাব নেই। সপ্তাহে সপ্তাহে উতোর-চাপানোর খেলা বেশ জমে উঠেছে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্বেতপাথরের টেবিলে বিপুলের লেখা আর এগোবে না। কারণ বিপুল যে ব্লাডি বাগার নিজে এসে দেখে গেছে এবং মনে হয় এ বাড়ির ত্রিসীমানা সে আর মাড়াবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ব্লাডি বাগার মানে কি রে। মানেটা আমি ঠিক জানতুম না। বিপুল মুখ চুন করে চলে গিয়েছিল।

মা দাদুকে তাড়াতাড়ি টেবিল-ছাড়া করলেন। ঠিক হল দাদু সনাতনের দোকানে গিয়ে বসবেন। সনাতন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে, কাঠটা অক্ষত আঙুল থেকে খোলা যায় কিনা। 'দাঁড়া তুলসী, চপ দুটো বাঁ হাতে চট করে খেয়ে নি।' মা আঁতকে উঠলেন, 'না না, ওপরে আসার সময় হয়ে গেছে, আপনি এখুনি পালান।' এক হাতে ঠোঙা, অন্য হাতে আঙুলে গলান কাঠের টুকরো, পায়ে কালো ক্যাম্বিসের জুতো, দাদু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, পেছনে সনাতন, হাতে যন্ত্রপাতি। অন্যদিকে বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাবা উঠে আসছেন। মুখে প্রেসার কুকারের শব্দ। পেছনে নিরঞ্জন, হাতে খুরপি, সারের কলসি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে বোঝার উপায় নেই, পাথরের তলার এক পাশের কেরামতি ঝরে গেছে। মা আশা করেছিলেন, দুর্ঘটনাটা তক্ষুণি ধরা পড়বে না। কিছু দিন হয়তো চাপা থাকবে। বলা যায় না, সনাতনের অদ্ভুত

কেরামতিতে কাঠের টুকরোটা দাদুর চাঁপাকলার মত আঙুল থেকে হয়ত খুস করে খুলে আসবে। তারপর অফিস-বারে বাবার অনুপস্থিতিতে আবার যথাস্থানে বহাল হয়ে যাবে। বাবা ওপরে এসেই এক গেলাস জল চাইলেন। বেশ মোটা কাঁচের একটা বড় গেলাস ছিল। প্রায় সেরখানেক জল ধরত। জলের গেলাসটা হাতে নিয়ে টেবিল থেকে কিছু দূরে মেঝেতে উবু হয়ে বসলেন। জল খাবার এইটাই ছিল তাঁর ধরন। একটু একটু করে জল খাচ্ছেন আর সামনের জানালা দিয়ে রোদ-ঝলসানো দ্বিপ্রহরের সুনীল আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। জল খেতে খেতে মাঝে মাঝে আঃ আঃ করে অদ্ভুত শব্দ করছেন। কিছু দূরে মা উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জানালার সামনে টেবিল। শ্বেতপাথর সমাধি-ফলকের মত শুভ্র। রবিবারের সমস্ত শান্তি যেন সেই মুহূর্তে ওই পাথরের তলায় সমাহিত। শেষ চুমুকে জলটা সমস্তই খেয়ে ফেলে বাবা একটা ফাইনাল শব্দ করলেন। ভেন্টিলেটার থেকে একটা চড়ুই পাখি উড়ে গেল। ঘুলঘুলিটার দিকে একবার তাকালেন। গত কয়েক রবিবার ধরে শুনছি ওই গর্তটা টিন মেরে বন্ধ করা হবে। গেলাসের তলানি শেষ বিন্দু জলটা ঝেড়ে ফেলে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। যাক, দেখতে পাননি। দেখে ফেলতেও পারতেন। যে জায়গায় বসেছিলেন সেখান থেকে টেবিলের তলা ও পাশ সহজেই নজরে পড়ে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে দুম দুম করে হেঁটে বাবা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। সব কিছুতেই স্পিড–এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কেবল একটা জিনিসে স্পিড ছিল না, সেটা হল ইভ্যাকুয়েশান। কনস্টিপেশানের ব্যাপার। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন, এমন একটা উপায় থাকত ব্লাডারটা খুলে ফেলে ঝেড়ে ফেলা যেত। নিরঞ্জন সময় সময় আদেশমত পেটটা প্যাঁক প্যাঁক করে দিত। একমাত্র বেলের সিজনে খুঁতখুঁতুনিটা একটু কত থাকত।

BANGLADARSHAN.COM

আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত সময় পাওয়া গেল। তার আগে বাথরুম থেকে বাবার বেরোবার সম্ভাবনা নেই। মা আর আমি দৌড়ে রাস্তার দিকে জানালার ধারে গেলুম। সনাতনের দোকানে দাদুর আঙুল থেকে কাঠ খোলার কসরত চলেছে। সনাতন একা দোকানে বসে আছে, দাদু নেই। অন্য সময় সনাতন হামেশাই জানালার দিকে মিটমিট করে তাকায়। সেই মুহূর্তে সনাতন তন্ময়। কি যে করছে! অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর সনাতন হলদেটে চোখে তুলে তাকাল। মা হাতের ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন–কি হল? সনাতন ফিক্ করে হেসে দু খণ্ড কাঠ তুলে দেখালে। দাদু আঙুল ঢুকিয়েছিলেন একটা চিড়িতনে। সেই জায়গা থেকেই কাঠটা দু টুকরো হয়ে গেছে। মার মুখের মৃদু হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠল।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই বাবা সেদিনের বুলেটিন ঘোষণা করলেন–অ্যাবসোলিউটলি নো ইভ্যাকুয়েশন। নিরঞ্জন সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মানে না বুঝলেও ইংরেজিটা তার চেনা। সঙ্গে সঙ্গে বললে–'একটু একটু প্যাঁক প্যাঁক!' বাবা বললেন–'এখন না। দাঁড়া একটু চা খেয়ে দেখি।' মা খুব দরদ দিয়ে চা করে দিলেন। একে কোষ্ঠ সাফ হয়নি, তার ওপর টেবিল ভেঙেছে। ভেঙেছেন আবার মার বাবা। ভাল চায়ে মেজাজটা যদি একটু নরম হয়।

বেলা দেড়টার সময় শুরু হল পুটি দিয়ে টেবিলের পাথর পরিষ্কার করার কাজ। মা আশ্রয় নিলেন মেজ জ্যাঠামশায়ের ঘরে। জ্যাঠামশায় একটা পুরোনো টুথব্রাশ দিয়ে ঘাড়ের কাছের চুলে কলপ লাগাচ্ছিলেন। গায়ে একটা খড়খড়ে তোয়ালে। এই বাড়ির সমস্ত অপরাধীর আশ্রয়দাতা মেজ জ্যাঠামশায়। উদারপন্থী, সদাহাস্যময়। মর্যোল-ফর্যা লের ধার ধারেন না; আবেগের নির্দেশে কাজ করেন।

আমি বহুবার জ্যাঠামশায়ের শরণাপন্ন হয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। মার বরাতে কি হবে বলা শক্ত। সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরেই ওই শ্বেতপাথরের টেবিলে বাবা যখন আমাকে পড়াতে বসবেন, বাড়ির সকলেরই অবস্থা তখন ছিলে-টান ধনুকের মত। কখন কি হয়। প্রথমেই হোমটাস্ক। টাস্কের চৌকাঠেই প্রথম হোঁচট। একটা ভুল, দুটো ভুল। মেজাজের পারা চড়ছে ব্যারোমিটারের মত। আবহাওয়ার পূর্বাভাস। ঝড় এলো বলে। মেঘ ডেকে উঠলো—'সারাদিন কি করা হয়েছে? গুলি, ঘুড়ি, গল্পের বই?' অপরাধ চাপা থাকে না। বাবা উঠে পড়লেন। জয়েন্ট ফ্যামিলির মুখ—ফাঁদালো উনুনে প্রথম আহুতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি থেকে আনা 'আবার যখের ধন'। শ্বেতপাথরের টেবিলের তলায় পাদানিতে লুকোনো ছিল। যেকোনো গুপ্ত জিনিস গুপ্ত চিন্তা টেনে বের করার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল বাবার। তারপরেই উনুনে পড়ল সিন্দুকের পাশে লুকোনো সুতো ভর্তি লাটাই। সবে চ্যাঁভোঁ মাঞ্জা দিয়ে রাখা। তারপরই ঘুড়ির কাঁপকাঠি, বুককাঠি ভাঙার পটাপট আওয়াজ। মনে হচ্ছে বুকের এক-একটা পাঁজর ভাঙছে। সেই সঙ্গে বাবার সিংহ বিক্রমে দাপাদাপি আর চিৎকার—'শয়তান শয়তান, সেটান, সেটান।' মা কিছুটা দূর থেকে গরাদের-ওপাশে-থাকা ফাঁসির আসামীর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে করুণ কণ্ঠে আমাকে বলতেন—'কেন বাবা ঠিক করে অঙ্কগুলি কষলি না!' সব শেষ করে, সব শ্মশান করে দিয়ে বাবা আবার টেবিলে এসে বসতেন। বুক ভর্তি কাঁচাপাকা চুল। ফোঁটাফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে। এদিকে এত কাণ্ডের পরও ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে। মাথা ঝুঁকে আসছে টেবিলের পাথরের দিকে। বাবা তাক করে থাকতেন। মাথাটা প্রায় কাছাকাছি এলেই পিছনে এক ভুঁই থাপ্পড়। ঠাঁই করে কপালটা পাথরে ঠুকে ঘুম ছুটে যেত আপনি। চোখের সামনে সাদা শ্বেতপাথর, কপালে ঠিকরে আলুর যন্ত্রণা, পাথরে কোঁদা চুলওলা বাবা, খোলা বইয়ের পাতায় নৃত্যশীল কালো কালো অক্ষর। জীবনের অন্ধকারতম দিনে আলোর বীভৎস সাধনা। জ্যাঠামশায়ের কাতর প্রার্থনা—'ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দে'। যেন বাঘে ধরেছে। বাঘের সংক্ষিপ্ত গর্জ্জন—'ডোন্ট পোক ইওর ফাইন নোজ।' কর্তা সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, ক-তো বা-আর বলতে হবে, কনডেনসড ইডিয়েট। লেখো। বড়ো বড়ো করে।'

সামনের রাস্তার গভীর রাতের এক-আধটা পথিক, অজস্র কুকুরের লুটোপুটি ঝগড়া। সেই মেজ জ্যাঠামশায়ের কাছে শেলটার নিয়েছেন মা। কত দূর কি হবে বলা শক্ত। চুলে কলপ লাগানো বন্ধ। দরজার পাশ থেকে গুপ্তচরের মত একটা মাত্র চোখ বের করে আমি ওয়াচ করছি। মেজ জ্যাঠামশাই আশা দিচ্ছেন মাকে—'কোনো ভয় নেই বউমা, আমি ফেস করব। আজ আমি তোমার জন্যে জান দিয়ে দেবো।' পাথরে পুটি চড়ল। চারপাশে ঘুরে ঘুরে কাপড় দিয়ে পাথর ঘষছেন। জানালার দিকের অংশে গিয়ে বাবা হঠাৎ উঃ করে লাফিয়ে উঠলেন। নীচু হয়ে মেঝে থেকে কি একটা তুলে নিলেন। স্ক্রু। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি হল?

BANGLADARSHAN.COM

কোত্থেকে এল? কোন্ শয়তানের কাজ!' মার মুখ বিবর্ণ। মেজ জ্যাঠামশাই প্রস্তুত। মুখ দেখে মনে হল–তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, 'চিত্রে সমর' বলে একটা বই বেরোতো, সেই বইয়ের পাতায় দেখা যুদ্ধবন্দীদের মুখের মত করুণ।

স্ক্রুটা দু আঙুলে ধরে বাবা নীচু হয়ে টেবিলের পাশটা দেখতে লাগলেন, কোথা থেকে খুলে পড়েছে, ব্যস ধরে ফেলেছেন। একবার দেখলেন। দুবার দেখলেন। সোজা উঠে দাঁড়ালেন। স্বগতোক্তি–'এ কি হল? নিরঞ্জন!' দুবার ডাকলেন। 'ভেগেছে। হাওয়া হয়ে গেছে।' জানালার দিক থেকে সরে এসে দরজার দিকে মুখ করে চিৎকার করে বললেন, 'নিরঞ্জন কি মরে গেছে?'

জ্যাঠামশায় বেরিয়ে এলেন। ঘাড়ের কাছে কিছু চুল কালো, কিছু তামাটে। জ্যাঠামশায় বাবার কাঁধে হাত রেখে, আস্তে আস্তে মোলায়েম করে বললেন, 'চল একটু বসি, উত্তেজিত হসনি।' বাবা খুব অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'চল না একটু বসি। একটু বসি।' একটু বসাটাকেই ঠুংরী গানের মত জ্যাঠামশাই বার কতক বললেন। কোয়েলিয়া গান থামা এবার, গান থামা এবার, গান থামা এবার। 'কিন্তু আমার তো বসার সময় নেই।' মুখ বিকৃত করে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে বাবা তাঁর সময়ের অভাবটা জ্যাঠামশাইকে জানিয়ে দিলেন। এই জানানোর মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। কারণ জ্যাঠামশাই চুল রঙ করছিলেন আর বাবা টেবিল সাফ্ করছিলেন। একটা অকাজ। অন্যটা কাজ। কাঁচুমাঁচু মুখে জ্যাঠামশাই বললেন, 'কথা আছে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় তোর নেবো না।'

BANGLADARSHAN.COM

দু'জনে দুটো চেয়ারে বসলেন। বাবা কোনো রকমে পেছনটা চেয়ারের ডগায় ঠেকিয়ে রাখলেন। শরীরের পুরো ভারটা রইল পায়ের উপর। হাত দুটো হাঁটুর উপর টান-টান। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো খোলা আকাশে লটকানো। এই রকম একটা ভঙ্গি, এই রকম একটা মুখের সামনে বসার শক্তি চাই। জ্যাঠামশাই ঘটনাটা বলে চলেছেন। মুখটাকে ঈষৎ বাঁকিয়ে বাবা শুনছেন। কোনো সময় জ্যাঠামশায়ের দিকে তাকাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে নাকের ওপর কপালের কিছুটা অংশ কুঁচকে যাচ্ছে। ঘটনার বর্ণনা শেষ করে জ্যাঠামশাই বাবার হাত দুটো স্পর্শ করে বললেন–'তুই আর এই নিয়ে রাগারাগি করিসনি। বউমা ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপরই অ্যাকশান। হাঁটুতে চটাস করে চারটে চাপড় মেরে বাবা বললেন, 'হোয়াই সনাতন, হোয়াই সনাতন! আমি কি মরে গিয়েছিলুম?'

'না না, মরে যাবার কথা আসছে কি করে? তুই ব্যাপারটা অন্যভাবে নিচ্ছিস। মুকুজ্জেমশায়ের আঙুল তুই খুলবি সেটা ভালো দেখায় না বলেই–'

‘ভাল দেখায় না বলেই একটা উটকো বাইরের লোককে ডেকে টেবিলটার সর্বনাশ করতে হবে। আমি হয়তো কাঠটা ইনট্যাক্ট রেখেই খুলতে পারতুম। আমাকে একবার চান্‌সই দেওয়া হল না। কেন হল না? বলতে পার কেন হল না! এক্‌সপ্লেন।’

‘একটা সামান্য ব্যাপার, তোকে বিরক্ত না করে যদি হয়ে যায় তাই আর কি। সনাতন পুরোনো লোক। যন্ত্রপাতি রয়েছে। টুক করে খুলে দিলে।’

‘সেই কাঠ আর কেয়ারিগুলো কোথায়?’

জ্যাঠামশায় ঘটনার সেকেণ্ড পার্টটা জানতেন না। অসহায়ের মত মুখ করে দরজার দিকে তাকালেন—‘বউমা।’

‘ও তুমিও জান না। সনাতনকে তুমি ডেকেছিলে?’

‘আমি, আমি পাশের ঘরেই ছিলুম। সনাতন তো চোখের সামনেই থাকে। ওই তো কাজ করছে। চোখাচোখি হতেই চলে এল আর কি। ডাকতেও হয় না। ইশারাতেই কাজ হয়।’

‘কার ইশারা?’

জ্যাঠামশায় খুব বিপদে পড়লেন। বাবা ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

‘দেখেছো বাড়ির ডিসিপ্লিন কোথায় নেমে গেছে? বাড়ির বউ কাউকে কিছু না বলে জানালা দিয়ে ইশারা করে একটা লোফার মিস্ত্রিকে হুট করে ডেকে নিয়ে এল। টেবিলটা বড় কথা নয়, মেজদা, বড় কথা হল ডিসিপ্লিন। তুমি পাশে রয়েছো জানলে না, আমি নীচে রয়েছি জানলুম না। এ হাইড অ্যান্ড সিক গেম। নিপ ইন দি বাড।’

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। জ্যাঠামশায়ের শেষ চেষ্টা—‘শোন্‌, আমার অনুরোধ, আমি তোর চেয়ে বয়সে বড় তো, একটা রিকোয়েস্ট, এই নিয়ে তুই আর গোলমাল করিসনি। ব্যাপারটা বড্ড ডেলিকেট, বুঝলি। আমি তোর পয়েন্টটা বুঝেছি।’

হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে বাবা বললেন—‘নো কমপ্রোমাইজ।’

জ্যাঠামশায়ের মুখটা একটু কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। বউমাকে আশা দিয়েছিলেন শেলটার দেবেন কিন্তু দাবার চালে বাবা কিস্তি মাৎ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জ্যাঠামশায়ও উঠে দাঁড়ালেন। বাবার চেয়ে লম্বা, একটু কৃশ, অল্প কোলকুঁজো।

বাবার চেতানো বুকের সামনে বড় বেশি দুর্বল।

আমরা সকলে ভেবেছিলাম বাবা ঘরের দিকে যাবেন। তিনি ঘুরে রাস্তার দিকে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। গরাদহীন ফরাসী জানালা দিয়ে বুকের আধখানা রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। কি করতে চাইলেন

বোঝা গেল না। জ্যাঠামশায় কিছু দূরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। আমার মনে হল, মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাচ্ছেন বোধ হয়। কিংবা সনাতনকে ডাকবেন। হঠাৎ জানালার বাইরে হাত বের করে ফটাফট করে বারকতক তালি বাজালেন। কাকে ডাকছেন? চিৎকার করে ডাকাটা, 'আউট অব ইংলিশ এটিকেট'। তালিতে কাজ হল না। যতদূর সম্ভব চাপা গলায় ডাকলেন—'শরৎ, শরৎ, এ...এই শরৎ।' শরৎ কি করবে? শরৎ বোধ হয় সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বাবার ডাকে মুখ তুলে তাকাল মনে হয়।

'তোমার গাড়িটা নিয়ে এখুনি একবার এস।' রাস্তা থেকে শরতের গলা শোনা গেল, 'আমি এইমাত্র গ্যারেজ বন্ধ করে খেতে যাচ্ছি।'

'আধ ঘণ্টা পরে খেতে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'আমি খেয়ে আসি না ছোটবাবু!'

'দশ টাকা দেব, কুড়ি টাকা দেব, এখুনি গাড়ি বের কর।'

তেরপলের হুক লাগানো শরতের একটা প্রাচীন গাড়ি ছিল। চারদিক খোলা। আধকাটা দরজা। দরজার সব ক'টা লক ভাঙা। আরোহীরা উঠে বসলে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। পিছনের সিটে গদির বদলে কয়েকটা মাথার বালিশ পাতা। এই গাড়িটাই আমাদের পারিবারিক ভ্রমণে, উৎসবে নানা সময়ে ভাড়া খাটত। শরতের গাড়ি দুঃখের দিনে, আনন্দের দিনে।

BANGLADARSHAN.COM

বাবা জানালা থেকে সরে এলেন। বোঝা গেল শরৎ আবার বাধ্য হয়েই গ্যারেজের দিকে ফিরে গেল। সেই গোড়ালির উপর ভর দিয়ে যেমন দুমদুম করে হাঁটেন সেই ভাবেই হেঁটে বাবা ঘরে ঢুকলেন। জ্যাঠামশায় বাবাকে অনুসরণ করছিলেন। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাকে কাপড় নিতে দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি কি হবে রে? এই এত বেলায়।' বাবা কোনো উত্তর দিলেন না। প্রায় ছিটকে আর একদিকে চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বাবা মালকোঁচা মেরে কাপড় পরলেন, তার উপর চাপালেন সাদা টেনিস শার্ট। ছুটির দিন দাড়ি কামাননি, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। 'চললি কোথায়?' জ্যাঠামশায় এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব পেলেন না। সব কিছুই ঘটে চলেছে, 'স্পেকটাকুলার স্পিডে'।

গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবা হাঁকলেন—'নিরঞ্জন।' নিমেষে নিরঞ্জন সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের কোণের দিকে মার চকোলেট রঙের ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে বললেন—'তুলে দে গাড়িতে।' এমন ভাবে বললেন যেন ওই ট্রাঙ্কটার মধ্যে মার অনেক দিনের গলিত মৃতদেহ রয়েছে। বাবা এগিয়ে গেলেন জ্যাঠামশায়ের ঘরের দিকে। মা তখন খাটের এক পাশে পা ঝুলিয়ে বিষণ্ণমুখে বসে আছেন। অসম্ভব ফর্সা রঙ। রক্তশূন্যতার জন্যে আরো সাদা দেখাচ্ছে। আমার আবির্ভাবের পর থেকেই মার শরীর ভীষণ ভেঙে গেছে।

আমার নাকি ভুমিষ্ঠ হবার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। জঠরের ঈশান কোণে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম, বোধ হয় বাবার ভয়ে! তারপর এক সময়ে উপায় না দেখে হেলানো পাটাতন বেয়ে লোকে যেমন হড়কে নামে সেইভাবে সড়াৎ করে নেমে এলুম। আসার সময় মার একটা ভাইরাল নাড়ী উপবীতের মত গলায় জড়িয়ে এনেছিলুম। বাপকো বেটারা বোধ হয় এই কায়দায় জন্মায়। আগে মাথাটা বের করে হালচাল দেখে নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। তাতেও মার কি আনন্দ! অসংখ্য সন্তানের জননী হবার ইচ্ছে ছিল মায়ের। গিনিপিগের মত ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। বাবার ঠিক উলটো। ওয়ান ইজ এনাফ। সেকেন্ড ইজ অ্যাকসেপটেব্‌ল উইথ এ স্ট্রাকচার।

বিছানার উপর হাতের চেটোটাকে উলটো করে রেখে মা আপন মনে আঙুল গুনছিলেন। লম্বা লম্বা আঙুল। একটা সাদা পোখরাজের আংটি জ্বলজ্বল করছে অনামিকায়। বাবা একেবারে মার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।–'ওঠো।' মা ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো।' বাবা চলতে শুরু করলেন। জানেন এ আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারুর নেই। মার পরনে একটা নীল বুটিদার শাড়ি। জ্যাঠামশায়ের এইটা লাস্ট চান্‌স। নিজের কোর্টে প্রতিপক্ষকে পেয়েছেন। দরজা আগলে দাঁড়ালেন। 'এই দুপুর বেলা বউমাকে নিয়ে কোথায় যাবি?'

'তুমি পঞ্চতন্ত্র পড়েছ?' দরজা থেকে একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে বাবা প্রশ্ন করলেন। জ্যাঠামশায় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। 'বুঝেছি পড়নি। পড়বে কখন? জীবনে দুটি জিনিস।' দুটো আঙুল তুলে হাতের একটা ভঙ্গি করলেন, 'চুল আর মাছ। শুনে রাখ, শরীরের জন্যে প্রয়োজন হলে একটা অঙ্গ ত্যাগ করবে। গ্রামের জন্যে একটি পাড়া, শহরের জন্য গ্রাম, দেশের জন্যে শহর। ফর দি স্যাংটিটি অব দি ফ্যামিলি লেট দেম বি রিমুউভড্।' মুউ শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দরজাব্যুহ ভেদ করার জন্যে এগিয়ে এলেন। জ্যাঠামশায় কিন্তু প্রকৃত বীরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন স্বদেশী আমলে একটা কথা প্রায়ই আমাদের কানে আসত–ডু অর ডাই। জ্যাঠামশায়ের সাহস দেখে মনে হল এই সঙ্কটপূর্ণ দিনে তাঁর ব্রত হল–ডু অর ডাই। 'তোর স্বেচ্ছাচারিতে দিন দিন বেড়েই চলেছে। হিটলারের মত একটা ডিক্‌টেটার হয়ে উঠছিস। বউমাকে তুই কোথাও নিয়ে যেতে পারবি না। আই ওন্ট অ্যালাও।' জ্যাঠামশায়ের মুখে ইংরেজী মানে তিনি খুব রেগে গেছেন। শুকনো তোয়ালেটা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল, দু হাতে তাড়াতাড়ি চেপে ধরলেন আর 'গাদি' খেলার খেলোয়াড়ের মত বাবা সট্ করে দরজা গলে বেরিয়ে গেলেন। মা দাঁড়িয়ে রইলেন, কি করবেন ভেবে পেলেন না। শেষে বললেন, 'আমি তবে আসি।'

'কোথার আসবে তুমি মা? তুমি এইখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। হু ইজ হি? এ টাইরান্ট! আই উইল সি হিম।'

জ্যাঠামশায় হাঁকলেন–'নিরঞ্জন।'

রাস্তা থেকে উত্তর এল–'যাই মেজবাবু।'

BANGLADARSHAN.COM

‘নামিয়ে নিয়ে আয়।’

‘বাক্সটা?’

‘হ্যাঁ বাক্স।’

নিরঞ্জন চলে গেল বাক্স আনতে।

বাবা পাল্টা নির্দেশ দিলেন, ‘খবরদার নামাবি না।’ নিরঞ্জন সিঁড়ির বাঁকে থেবড়ে বসে পড়ল। জ্যাঠামশাই টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে ঘোষণা করলেন, ‘এই বাড়ি থেকে কারুর একপা বেরুনো চলবে না। এটা জয়েন্ট ফ্যামিলি। কারুর একার মতে সংসার চলবে না।’

বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন, ‘অবিশ্বাসী, ষড়যন্ত্রকারী স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চলে?’

‘বউমা এর কোনটাই নয়। তোমার চিরকালের স্বভাব তিলকে তাল করা। আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউ।’

‘আমার ফ্যামিলি আমার মত চলবে। এ সব ব্যাপারে নো লিনিয়েনসি।’

শরৎ রাস্তা থেকে চিৎকার করে উঠল, ‘কি হল রে বাবা!’

BANGLADARSHAN.COM

জ্যাঠামশাই চিৎকার করলেন, ‘নিরঞ্জন, রাসকেল, বাক্স নামিয়ে আন আর শরৎকে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় কর।’

‘আমাকে ছোটবাবু জুতোপেটা করবেন।’

‘আমি তোকে ডাণ্ডাপেটা করব রাসকেল। তোমার ফ্যামিলি কি? আমরা তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম। বউমা তোমার একার নয়। এই বাড়ির বউ।’

নিরঞ্জন বাক্সটা ঘাড়ে করে ওপরে উঠে এল। শরতের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

‘তুমি জামাকাপড় খুলবে কি না?’

‘মেজদা, তোমার প্রশ্রয়ে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।’

‘যায় যাবে। ডোন্ট ফরগেট, সংসারটা তোমার অফিস নয়। কথায় কথায় ডিসচার্জ আর চার্জশিট করবে।’

‘স্বীকার করুক অন্যায় হয়েছে। আই উইল পার্ডন হার।’

‘বউমা।’

মা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন, দরজার পাশেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ একেবারে বিবর্ণ।

‘বলো অন্যায় হয়ে গেছে।’

বাবা বুক চিতিয়ে চিবুক উঁচু করে দাঁড়ালেন। মা গলায় আঁচল দিয়ে খুব মৃদু সুরে বললেন, ‘আমার অন্যায় হয়ে গেছে।’

বাবা মুখ উঁচু রেখেই বললেন, ‘আর কখনো এরকম কোরো না। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। পানিশেবল অফেন্স। কক্ষনো নিজে কোনো ডিসিসান নেবে না। মেয়েছেলে, মেয়েছেলের মত থাকবে।’

মা পিছন ফিরে ধীরে ধীরে চলে যেতে যেতে নারীর অধিকার সংক্রান্ত শেষ উপদেশ শুনে নিলেন।

সেই শ্বেতপাথর। সেই শ্বেতপাথর দাঁড় করানো রয়েছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। সেই নক্‌শা ফ্রেম চলে গেছে উইয়ের পেটে। আর শ্বেত বলা চলে না, অব্যবহারে ধূসর। জীবন থেকে চল্লিশটা উত্তপ্ত বছর বাষ্পের মত বের করে দিয়ে বরং বাবার চুল এখন প্রকৃত দুগ্ধশুভ্র। মা এখন অয়েল পেন্টিংয়ে অস্পষ্ট স্মৃতি। জ্যাঠামশায় একটি ধূসর ছবি। শুকনো মালায় মাকড়সার লালা। দাদুর লাউফাটা তানপুরা গলায় দড়ি দিয়ে হুক্‌ থেকে ঝুলছে। চিবুক উঁচু করে বাবা এখনো দাঁড়াতে পারেন কিন্তু পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসার মত কেউ এ পরিবারে আর অবশিষ্ট নেই।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥